Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XV, Issue-I, October 2026, Page No. 30-41
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.15.issue.01W.133

মতুয়া ধর্ম গ্রহণের প্রয়োজন কেনো?

ড. তেজেন মন্ডল, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, শ্রীকৃষ্ণ কলেজ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.10.2026; Accepted: 26.10.2026; Available online: 31.10.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Atheists argue that there is no such thing as God in this world. Therefore, there is no real need for the religious practices that have developed around Him; they see these practices simply as a business strategy that wastes both time and money. Marxists have compared religion to opium. Similarly, the Charvaka philosophers of Hindu thought did not accept the existence of God. They wanted to live as human beings, for human beings, relying on reason and science.

They believe that the main problem is that most religious people fail to understand the basic question: what is the real purpose of human life? As a result, religious people often behave in ways that are no different from the irreligious and sometimes become terribly inhuman. At present, nearly 79.8 per cent, or around 115 crore people, in India are Hindus and believe in Hinduism. Ideally, all of them should have been able to speak in one voice. But in reality, this has not been possible. That is why different religions and schools of thought such as Buddhism, Jainism, Charvaka (Lokayata philosophy), and Matua emerged in opposition to it.

Religion means that which a person accepts and follows in order to find a path towards a better and more meaningful life, following its teachings so that one can realise the good and welfare of life. But in a pluralistic country like India, the force that has been described as Brahminism and is seen as a major factor behind the division of people into different communities, castes, and tribes could not provide a universal principle for all. On the contrary, different communities coming together and becoming united as one people were often viewed with suspicion. They were divided on various pretexts, hated, exploited, oppressed, and treated with distrust. As a result, they were eventually forced to move away.

Keywords: Religion, Hinduism, Vaishnavism, Buddhism, Brahmanism, Matua

ধর্ম মানে না এ জগতে এমন মানুষের সংখ্যা প্রায় বিরল। মানুষের সুস্থ্য ভাবে বেঁচে থাকার সঠিক দিক নির্দেশনা পাওয়ার জন্য সমাজে কোনো না ধর্মের বিশেষ ভূমিকা আছে। তাইতো সৃষ্টি হয়েছে খ্রীষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, মতুয়া ইত্যাদি। শিশু যখন মায়ের কোলে জন্মায় ও পরিবারের মধ্যে বড়ো হয়, ধীরে ধীরে সে এই পৃথিবীর জল, মাটি, সূর্য, বাতাস, মহাশূন্য, দেহ-আত্মা, ঈশ্বরের ইতিবৃত্ত জানতে চায়, তখন সব পিতা-মাতার কাছে সব উত্তর থাকে না, আর তখনই বিকল্প হিসাবে মানুষ খুঁজে নেয় ধর্মকে এবং তাদের চিন্তা, চেতনা, অনুভূতি, খাদ্যাভ্যাস, রুচিবোধের ভিন্নতা হেতু এই পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম গড়ে উঠেছে নার্সিং হোমের

মতো। পারিপার্শ্বিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পরিস্থিতি অনুযায়ী ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পূর্ববঙ্গের সফলাডাঙ্গা গ্রামে মূলত উচ্চবর্ণীয় হিন্দু এলিট সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২) এবং হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে সমাজের অস্পৃশ্য প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে তাঁর নেতৃত্বে সংগঠিত হয় মতুয়া ধর্ম, যা প্রচলিত হিন্দু, বৈষ্ণব ধর্মাচার থেকে ভিন্ন এবং বস্তুনিষ্ঠ স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত।

হিন্দু ধর্মের চক্রান্ত ও মতুয়া ধর্ম: হিন্দু ধর্মীয় নীতি হরিচাঁদ ঠাকুরের আধুনিক মননে জানতে চায়, ত্রেতাযুগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র (ক্ষত্রিয়) শূদ্র তাপস শম্বুকের মুণ্ডচ্ছেদ কেনো করলো? দ্বাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (ক্ষত্রিয়) দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় শূদ্র সন্তান কর্ণকে কেনো অংশগ্রহণ করতে দেয়নি? যুদ্ধে পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা কেনো দেয়নি? গুরু দ্রোণাচার্য একলব্যের মতো বীরযোদ্ধা শূদ্র সন্তানের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেনো কেটে নিলো? সবইতো অছিলা, অনৈতিক ও চাতুর্যতা! এভাবে কোনো জাতিকে ছোটো করা যায় না! কলিযুগেও বৈষ্ণব গুরু চৈতন্যদেবের ভূমিকা শূদ্রদের কাছে খুব সুখকর হয়নি। (বিশ্বাস, মনোহর মৌলি, পৃ ৯৮) বৌদ্ধ ধর্মীয় ভারতকেও ক্রমাগত হিন্দু ধর্মের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার গভীর চক্রান্ত ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড রয়েছে। মৌর্য বংশের শেষ সম্রাট বৃহদ্রথ। তাঁকে তাঁর ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র সুঙ্গের হাতে খুন হতে হলো এবং সেই পুষ্যমিত্রের নির্দেশে একগুচ্ছ 'সংহিতা'র মতো হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ রচিত হলো, যা মূলত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের স্বার্থ বহন করে। আর শূদ্ররা দাসে পরিণত হলো। উচ্চবর্ণদের সাঁড়াশি চাপের কাছে শূদ্ররা স্বাভাবিক জীবন থেকে হারিয়ে গেলো অতল গহ্বরে; অজস্র মানুষ হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে যে যার সুবিধা মতো ইসলাম ধর্ম না হয় খ্রীষ্টান ধর্মে চলে গেলো। হিন্দু ধর্ম ভারমুক্ত হয়ে গেলো। (বিশ্বাস, মনোহর মৌলি, পৃ ৯৯) দ্বাদশ শতকেও (১১৬০-১১৭৯) বঙ্গ রাজা বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথা সংস্কারের মধ্য দিয়ে হিন্দু ধর্ম জাগরণের চেষ্টা ও নিম্নবর্ণীয় মানুষের উপর অত্যাচার চলতে থাকলো। চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতকে ভক্তি আন্দোলন ঘটলেও সমাজে ধর্মীয় আচার-আচরণে অজস্র বিধিনিষেধ, বর্ণ বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা স্তিমিত হয়নি। হিন্দু ধর্মের ধারক ও বাহকদের কাজ হলো মুখে হিন্দু হিন্দু করা, (হালদার, মহানন্দ, পৃ ১৫২) আর কার্যক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অস্পৃশ্যতার নামে নানা ভাগে বিভক্ত করা ও ঘৃণার পরিবেশ সৃষ্টি করা। আর মতুয়া ধর্মের ধারক ও বাহকদের কাজ হলো অস্পৃশ্যতা দূর করা, মানবিকতা জাগিয়ে তোলা এবং সব মানুষের যে সম মর্যাদায় এই পৃথিবীর জল হাওয়া গ্রহণ করে বেঁচে থাকার অধিকার আছে, বর্ণবাদী মানুষদের কাছে তার সুস্পষ্ট বার্তা পৌছে দেওয়া।

বৈষ্ণব ধর্ম ও মতুয়া ধর্ম: যদিও পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম (১৪৮৬) বেদাচার ও অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক সাড়া পড়ে, কিন্তু বেদাচার ও অস্পৃশ্যতা নিশ্চিহ্ন হলো না। সেখানে বলা হয়, একমাত্র সংসার জীবনের বাইরে ভগবান বিষ্ণুকে পাওয়া যায় এবং তার জন্য এই মায়ার সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়ে নির্জনে তপস্যা করতে হবে, ভিক্ষাবৃত্তি করতে হবে। এ পৃথিবীর সবাই যদি ঈশ্বরের নামে ভিক্ষা করে বেড়ায়, এতো ভিক্ষা দেবেটা কে? এর মাধ্যমে সুস্থ্য জীবন ও সমাজ গড়ে উঠতে পারে না বলেই হরিচাঁদ মনে করেন। সকলেই স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে পেতে চায়, এটাই জগতের সাধারণ নিয়ম। নিজের ঘর-সংসার ফেলে ঈশ্বর পাওয়ার নামে তীর্থ পর্যটন করে বেড়ালে ঈশ্বর পাওয়া যায় না, কিন্তু অন্যের পকেট ভর্তি হয়। তাছাড়া, যে মন্দিরে সকলের প্রবেশাধিকার থাকে না, অথচ দীক্ষা, প্রণামী নেওয়া হয়, পা ধুয়ে জল খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, এসব ধর্ম, ঈশ্বরের নামে কুসংস্কার আধুনিক মননের হরিচাঁদকে আঘাত করে। তারক চন্দ্র সরকার এই কারণে বলেছেন,

"বৈষ্ণবের কুটিনাটি খন্ডন কারণ।
সে কারণ অবতার পুনঃ প্রয়োজন।।" (সরকার, তারক, পৃ ৭)

বৌদ্ধ ধর্ম ও মতুয়া ধর্ম: প্রাচীনকালের বৌদ্ধ ধর্মের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের অন্ত্যজরা হীনমন্যতা কাটিয়ে খানিকটা আত্মজাগরণের পথ খুঁজে পেয়েছিলো। তবে, উনবিংশ শতাব্দীতে তার প্রবাহ অধিক মাত্রায় বাংলায় ধারণ করতে থাকে শুধুমাত্র মতুয়া ধর্মের প্রভাবে। বৌদ্ধ ধর্মের সাথে হরিচাঁদ ঠাকুরের মতুয়া ধর্মের বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায় যখন বৌদ্ধ ধর্মে পাপ-পূণ্য, স্বর্গ-নরকের পাশাপাশি মৃত্যুকে অধীশ্বর উল্লেখ করে এবং ঈশ্বর আছে, কি নেই সেই বিষয়ে নিরুত্তর থাকে। বৈষ্ণব ধর্মের মতো তাঁরাও মানুষের দুঃখ দূর করতে চেয়েছেন সংসারে আসক্তিহীনতার মধ্যে দিয়ে এবং এইজন্য তাঁদের বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া ব্রাহ্মণকে তারা বর্ণের শ্রেষ্ঠ অভিহিত করার জন্য হরিচাঁদ এসব কিছুকে নস্যাৎ করে দিলেন। তাঁর মতে, সংসারে থেকে শুধু ভোগে নিমজ্জিত না থেকে মেরুদণ্ড সোজা রেখে সংসারে ভোগের মাধ্যমে ত্যাগ করতে হবে। মুক্তির সহজ উপায় খুঁজতে তিনি বলেছেন,

"গৃহেতে থাকিয়া যার ভাবোদয় হয়।
সেই পরম সাধু জানিবে নিশ্চয়।।" (সরকার, তারকচন্দ্র, পৃ ৩২)

বস্তুবাদ ও মতুয়া ধর্ম: ভাববাদী ধর্মীয় চেতনায় ঈশ্বর প্রাপ্তির কথা বলা হলেও আধুনিক সময়ে মানব কল্যাণের সব থেকে বড়ো হাতিয়ার হলো বস্তুবাদী দর্শন এবং তা বহু পরীক্ষিত হয়েছে। বাস্তবকে মানতে গিয়ে চার্বাক দার্শনিকরা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে নস্যাৎ করেছেন, গৌতম বৌদ্ধরা নিরুত্তর থেকেছেন আর হরিচাঁদ ঠাকুর 'হরি'কে, অর্থাৎ জগতের দুঃখ দুর্দশা হরণ করেন যিনি, তাঁর উল্লেখ করেছেন। তবে কর্ম সাধনা বা গৃহ ধর্ম অনুশীলনে যেসব শ্রমজীবী মানুষ উৎপাদনে জড়িয়ে থাকে, তাঁদের কথাই তিনি বলেছেন। চিরন্তন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি ঈশ্বর ভক্তি দেখিয়েছেন। অর্থাৎ ভাববাদ ও বস্তুবাদের মিলন ঘটিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

"গৃহ ধর্ম গৃহ কর্ম করিবে সফল।
হাতে কাম মুখে নাম ভক্তিই প্রবল।।" (সরকার, তারকচন্দ্র, পৃ ৮)

অথচ হিন্দু বৈদিক মতে, চতুরাশ্রমের ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের উল্লেখ করে বাস্তবতাকে খাটো করে ফেলেছেন। (বিশ্বাস, মনোহর মৌলি, পৃ ১২৪-১২৫)

জন্মান্তরবাদ ও মতুয়া ধর্ম: জগত সৃষ্টির মূল রহস্য হলো জল, মাটি, আলো, বাতাস ও মহাশূন্য এই পঞ্চভূতের নির্দিষ্ট অনুপাতের মিলন। দুইভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেনের মিলনে এক বিন্দু জল সৃষ্টি হয়। এইভাবে হাজার হাজার বছরের কোনো এক সময়ে হাইড্রোজেন-অক্সিজেনের মিলনের মধ্য দিয়ে ঐ জলে এক কোষী প্রাণের সঞ্চার হয় এবং কোষ বিভাজনের ফলে ধীরে ধীরে কলা, অঙ্গ, তন্ত্র সৃষ্টি হয়। শত সহস্র বিবর্তনের ফলে মানুষের বর্তমান রূপ প্রকাশ পায়। পিতা-মাতা থেকেই আমাদের জন্ম হয়েছে এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর তাঁদের মৃত্যু হয়, এটাই চিরন্তন সত্য। পৃথিবীর সব কিছু ক্ষণস্থায়ী, যা কার্ল মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নীতির সাথে হরিচাঁদের চেতনা মিলে যায়। পৃথিবীতে স্বর্গ-নরক বলে কিছু হয়না। 'কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক কে বলে বহুদূর, মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক মানুষেতে সুরাসুর'। সুতরাং ভালো কাজের কর্মফল ভালো হয়, আর খারাপ কাজে নরক বাস হয় এই পার্থিব জগতে। ভালো কাজে পূণ্য, খারাপ কাজে পাপ। পরজন্মের ভয় দিয়ে ভূত-পেত্নীর গল্প সাজিয়ে চতুর বর্ণবাদী ব্রাহ্মণদের মানুষ ঠকানোকে হরিচাঁদ ঠাকুর মান্যতা দেয়নি। পিতা-মাতার সংসার জীবনের ভালোবাসায় জন্ম নিয়ে পিতা-মাতা সহ সকলকে নিয়ে সংসারকে সুখ শান্তিতে ভরিয়ে তোলাই সকলের কর্তব্য বলে তিনি মনে করেন।

অসাম্প্রদায়িকতা ও মতুয়া ধর্ম: মতুয়া ধর্ম সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেয়না। এই পৃথিবীতে যতো ধর্ম আছে, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান তাদের সকলকে মতুয়া ধর্ম আপন করে নিতে চায়। যদিও পূর্ববঙ্গের নিম্নবর্ণীয়

নমঃশূদ্রদের সাথে মুসলমানদের বিভিন্ন সময়ে দাঙ্গায় জড়িয়ে থাকার ইতিহাস আছে। কিন্তু তার পিছনে ছিলো দরিদ্র, নিরক্ষর চেতনাহীন মানুষকে নিয়ে উচ্চবর্ণীয় এলিট জমিদারদের উস্কানি। স্বভাবতই ভুলবশতঃ কেউ কেউ দাঙ্গা হাঙ্গামায় জড়িয়ে যায়। তবে, মতুয়া ধর্ম প্রসারের ক্ষেত্রে মুসলিমদের সহযোগিতাকে খাটো করে দেখা হয়না, বরং আপন মানুষ মনে করা হয়। তাঁরাও বিশ্বাস ও ভরসার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে মতুয়া ধর্ম দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে মতুয়া হয়ে উঠেছেন, আজো তার ট্রাডিশন দেখা যায় মতুয়া বারুনি মেলায়। (বিশ্বাস, মনোহর মৌলি, পৃ ১২৫) মতুয়া ধর্মে বলা হয়,

"জাতিভেদ প্রথা কিছু নাহি বাঁধাবাঁধি।
মতো' হলে সবে মিলে করে কাঁদাকাঁদি।।" (হালদার, মহানন্দ, পৃ ৪৬০)

শিক্ষা বিস্তার ও মতুয়া ধর্ম: জার্মানির নাট্য ব্যক্তিত্ব ব্রেখট বলেছেন, ক্ষুধার্ত হাতে বই হাতে তুলে নাও, ওটাই তোমার অস্ত্র। আর গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেছেন, শিক্ষা চাই, শিক্ষা চাই, শিক্ষিত মানুষ চাই। বই না পড়লে নিপীড়িত জাতির আত্মসত্ত্বা প্রতিষ্ঠিত হয় না; মুক্তি আসে না। ১৮৮১ সালের বিশাল জনসভায় তিনি বলেন,

"দত্তডাঙ্গা সভা মধ্যে গুরুচাঁদ কয়।
শিক্ষা বিনা এ জাতির নাহিক উপায়।।" (হালদার, মহানন্দ, পৃ ১৩৬)

কিন্তু সে সময় উচ্চবর্ণের হিন্দুদের স্কুলে নিম্নবর্ণীয় বিশেষত অস্পৃশ্য সমাজের মানুষদের শিক্ষায় প্রবেশাধিকার ছিলো না। কোনোক্রমে কোনো শূদ্র সন্তান যদি ভর্তির অনুমতি পেতো, তাহলে তাকে অবজ্ঞা অবহেলা করা হতো, অমর্যাদায় পিছনের সারিতে কিংবা মাটিতে বসতে বাধ্য করা হতো। তারা শিক্ষায় উৎসাহী হোক, তেমন পরিবেশও ছিলো না। হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। নিরুপায় হয়ে মুসলিমদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁদের পড়তে হয়েছে। শিক্ষা না হলে যে সকলে ঠকায়, তা তাঁরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন। তাঁদের অনুভূতিকে মর্যাদা দিতে এগিয়ে এলেন তাই নমঃশূদ্র, তেলী, মালী, মালাকার, তাঁতি, কুম্ভকার, কপালি, মাহিষ্য, দাস চামার, কামার, পৌণ্ড্র, মুসলিমরা। তাঁদের সার্বিক প্রেরণায় ১৮৮০ সালে ওড়াকান্দিতে তৈরী হলো সর্বপ্রথম সার্বজনীন স্কুল। গুরুচাঁদ ঠাকুর ব্যক্ত করলেন,

"খাও বা না খাও তা'তে দুঃখ নাই।
ছেলে-পিলে শিক্ষা দেও এই আমি চাই।।" (হালদার, মহানন্দ, পৃ ১৪৪)

সার্বিক শিক্ষা অভিযানের মধ্য দিয়ে ১৮৮০-১৯১৮ সাল পর্যন্ত পাঠশালা, নিম্ন প্রাইমারী, আপার প্রাইমারী, মিডিল স্কুল এবং হাইস্কুল মিলিয়ে ২,০৪৮ টি স্কুল, ১৯৩১ সাল পর্যন্ত শুধু ঢাকা ডিভিশনে নমঃশূদ্রদের উদ্যোগে ১,০৬৭ টি স্কুল এবং গুরুচাঁদ ঠাকুরের সারাজীবনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৩,৯৫২ টি পাঠশালা বা স্কুল গড়ে ওঠে, যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ঘটনা। ২০০০ সালে সারা ভারত ব্যাপি যে 'সর্বশিক্ষা অভিযান' প্রকল্প চালু হয়, সঙ্গত কারণে তার পুরো কৃতিত্ব গুরুচাঁদ ঠাকুরের। (বিশ্বাস, মনোশান্ত, পৃ ১৭৯) খ্রীষ্টান মিশনারীদের সহযোগিতায় ১৯৩৭ সালে মেয়েদের হাইস্কুল, এরপর তালতলা গদাধর হাইস্কুল, ডে স্কুল, রবিবাসরীয় স্কুল, ধাত্রী বিদ্যা (গাইনোকোলজি), তাঁত, টেলারিং, উলের কাজ শেখার স্কুল করেন, যা আজকে কর্ম শিক্ষা বিষয়ের নামান্তর। (বিশ্বাস, মনোশান্ত, পৃ ১৭৩) বিংশশতাব্দীর গোড়াতে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা যখন নিম্নবর্ণীয় অন্ত্যজ ছেলেদের পড়ার সুযোগ দেওয়া নিয়ে বিরোধীতা করতো, সেই সময় রাজা রামমোহন রায়ের তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পাওয়া যায় না। আর নারী শিক্ষার ভূমিকাও ছিলো শুধুমাত্র উচ্চবর্ণীয় হিন্দু নারীদের জন্য। (ঠাকুর, কপিল কৃষ্ণ, পৃ ১৮) সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয় সকল হিন্দু বর্ণের ছাত্রদের পড়ার সুযোগ করে দিতে পারেননি। সেখানে কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর পক্ষ থেকে অনুমতি চাওয়া হয় শুধুমাত্র কায়স্থ পর্যন্ত। বিনয় ঘোষ

উল্লেখ করেছেন, বেথুন স্কুলে বেথুন ও বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ১৮৪৭ সালে নারী শিক্ষায় শুধুমাত্র এলিট পর্যায়ের হিন্দু নারীদের পড়ার ছাড়পত্র দেওয়া হয়। (ঠাকুর, কপিল কৃষ্ণ, পৃ ১৯)

নারীর মর্যাদা ও মতুয়া ধর্ম: বিশ্বের সব ধর্মে পুরুষের মতো অধিকারের ক্ষেত্রে নারীকে সম মর্যাদায় একই সময়ে নিয়ে যেতে পারেনি; পর্যায়ক্রমে তাঁদের মূল্য দিতে সমর্থ হয়েছে। খ্রীষ্টান ধর্মে নারীকে অসম্মান করা হয়েছে। তারা নাকি আবেগপ্রবণ ও অপরিণত সত্তা। মুসলিম ধর্মেও নারীদের কোনো আত্মা নেই উল্লেখ করেছে। এই কারণে এখানে একজন পুরুষ একাধিক বিয়ে করতে পারে। (মুখোপাধ্যায়, প্রলয়দেব, পৃ ৫৬) হিন্দু ধর্মে (মনুসংহিতা, গীতা, বেদ) বলা হয়েছে, পুরুষকে দুষিত করাই নারীদের স্বভাব। তারা নরকের দ্বার। তুলসী রামায়ণে বলা হয়েছে, শূদ্র ও নারীদের ঢোলের মতো না পেটালে ঢোল যেমন ভালো থাকে না, তেমনি তারাও কথা শোনে না। এইজন্য ধর্মের দোহাই দিয়ে পুরুষতান্ত্রিকরা অনন্তকাল যাবৎ সতীদাহ, ডাইনি প্রথা, গৌরী দান, সেবা দাসী, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ বহাল তবিয়তে চালিয়ে গেছে। (বৈরাগ্য, পুষ্প, পৃ ২৪৩) বৈষ্ণবধর্মেও ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদের পূজনীয় করে তুলেছে। এটা মানবতার লজ্জা। 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে' এই মানসিকতাকে যারা গুরুত্ব দেয়, তারা আর যাইহোক নারীকে সম্মান করছে, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম বলেন, বিশ্বের যা কিছু মানুষের মহান, কল্যাণকর সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে পুরুষের মতো নারীরও সমান অংশ রয়েছে। গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেছেন,

"নর-নারী দুইজনে প্রতি কাজে প্রতিক্ষণে,
তালে তালে হও অগ্রসর।" (হালদার, মহানন্দ, পৃ ৪৪৩)

তাঁরা পুরুষের সাথে লেখাপড়া শিখবে, চাকুরী করবে, সংসার করবে, সবকিছুতে লাজ দেখাবে না, আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সমাজকে নেতৃত্ব দেবে, প্রয়োজনে বাঘের মতো সাহসিনী হয়ে উঠবে, মানুষের জন্য যে কাজ শুভ মনে হবে, সেই পথেই তাঁরা চলবে বলেই গুরুচাঁদ ঠাকুর মনে করেন।

কৃষি, বাণিজ্য ও মতুয়া ধর্ম: মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, একমাত্র কুকুর, গাধা ছাড়া চণ্ডালের অন্য কোনো ধন, সম্পদ থাকতে নেই (সরকার, জীবন কুমার, পৃ ১৮৭) এবং তার জন্য হিন্দু ধর্মীয় সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মের নামে যা খুশী তাই নির্দেশ করা হয়েছে। সংসারকে অসার উল্লেখ করে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞরা অশিক্ষিত শূদ্রদের শুধু ত্যাগের নীতি দিয়েছেন। আর ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট রাখতে গিয়ে শূদ্ররা ভিখারী হয়েছে। মতুয়ারা এসব ভড়ংবাজি মানে না। তাঁদের নীতি হলো সংসারের সুখ-শান্তি সমৃদ্ধশালী করার জন্য 'অর্থ' লাগে, যা উৎপাদনশীল ব্যবস্থার মধ্যেই সম্ভব। কৃষিকাজ তাই তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি তাঁরা শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে সৎ উপায়ে উপার্জন করে বেঁচে থাকতে চায়। হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্তদের কৃষি কাজের পাশাপাশি ব্যবসায় উৎসাহিত করেছেন, তেমনি গুরুচাঁদ ঠাকুর চাষাবাদের জমি বৃদ্ধির উপায় দেখিয়েছেন, মতুয়া ভক্তদের হাতেকলমে বাণিজ্য করতেও শিখিয়েছেন। টাকা ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে রোজগারের পথ করা যায়, সেটাও দেখিয়েছেন, যা আজকের ব্যাংকিং ব্যবস্থার নামান্তর। তিনি বলেছেন,

"লগ্নী কারবার তা'তে হয় ব্যবসায়।
লগ্নী কারবারে প্রভু অর্থকে খাটায়।।" (হালদার, মহানন্দ, পৃ ৯৮)

তাঁর ব্যবসায়িক বুদ্ধিতে ওড়াকান্দির নীলকান্ত চৌধুরী, নিজামকান্দির মহেশ বিশ্বাস (ব্যাপারী), মল্লকান্দির গিরি কীর্তনীয়া সাফল্য অর্জন করেন। (বিশ্বাস, মনোশান্ত, পৃ ১১৪) বিচরণ বিশ্বাস (পাগল) হাড়ের ব্যবসা, বড়ো গামলা গ্রামের শ্যামচরণ অধিকারী লবণের ব্যবসা, নারকেল বাড়ি গ্রামের শ্যাম দাস মাটির হাঁড়ির ব্যবসা, ড. উপেন বিশ্বাসের পরিবার ব্যবসার মাধ্যমে শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। (বিশ্বাস, মনোহরমৌলী, পৃ ১৩৭, প্রবন্ধে..) গুরুচাঁদ ঠাকুর স্মরণ করিয়েছেন,

"বাণিজ্য সাধুর কর্ম মহাজনে কয়।
মহাজন হলে তার মহামন হয়।।" (হালদার, মহানন্দ, পৃ ৯৮)

সরকারি চাকুরী ও মতুয়া ধর্ম: সরকারি চাকুরী পাওয়ার ক্ষেত্রে নমঃশূদ্র তথা আজকের তপশিলী জাতির কাছে বেশীরভাগটা অজানা। হিন্দু অন্ত্যজ পল্লী এলাকায় সকলের জন্য যেমন শিক্ষা ব্যবস্থা ছিলো না, তেমনি তাঁদের মধ্যে থেকে যদি কেউ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে স্বাক্ষর কিংবা শিক্ষিত হয়ে উঠতো, তার জন্য সরকারী চাকুরী বাঁধাধরাও ছিলো না। অস্পৃশ্যরা সরকারি অফিসে বসবে, আর তার পাশে বর্ণ হিন্দুরা বসবে, এই দৃশ্য উচ্চ বর্ণের মানুষ মোটেই মানতে চাইনি। গুরুচাঁদ ঠাকুর জানেন এই ঘৃণ্য ও সংকীর্ণতাকে ওভারকাম করতে না পারলে পতিত দলিত জাতির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাই তাঁরই উদ্যোগে সর্বপ্রথম ১৯০৭ সালে ইংরেজ সরকারের সৌজন্যে খ্রীষ্টান মিশনারী ডাঃ সি. এস. মীডের আন্তরিক সহযোগিতায় বিভিন্ন ডেপুটেশনের মাধ্যমে বিশেষ সংরক্ষণের মাধ্যমে সেই কাঙ্ক্ষিত সুযোগে প্রবেশ করে। একে একে দলিত সমাজের শশীভূষণ ঠাকুর, মোহনলাল বিশ্বাস, রাধানাথ মন্ডল, সিদ্ধেশ্বর হালদার, ডাঃ তারিনী বল, কুমুদ বিহারী মল্লিক প্রমুখের মতো ব্যক্তিত্বরা উচ্চ সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হন। (ঠাকুর, কপিলকৃষ্ণ, পৃ ৩৫)

ঐক্য সাধন, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও মতুয়া ধর্ম: পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জেলা গুলিতে নমঃশূদ্রদের প্রাধান্য থাকলেও সামাজিক শক্তি হিসাবে তাদের জেগে ওঠার একটা প্রধান অন্তরায় ছিলো পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতাবোধ। The Tribes and Caste of Bengal গ্রন্থের প্রণেতা H. H. Risley লিখেছেন, নমঃশূদ্ররা তখন আটটি উপবিভাগে বিভক্ত ছিলো এবং গোষ্ঠীগুলির মধ্যে তেমন আত্মিক সম্পর্ক ছিলো না। এমনকি এক জেলার সাথে অন্য জেলায় বৈবাহিক সম্পর্ক ছিলো না। নিজেদের মধ্যে আপন ভাব না থাকলে ঐক্যবদ্ধতা, আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না তা গুরুচাঁদ ঠাকুর উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলেন,

"শক্তি না দেখিলে কেহ করে না সম্মান।
শক্তিশালী হতে সবে হও আগুয়ান।।" (হালদার, মহানন্দ, পৃষ্ঠা ৫৭৩)

এই ভাবনায় তিনি দলিতের শিক্ষা চেতনা গঠনের জন্য চারিদিকে জাগরণী সভা করেন। (ঠাকুর, কপিল কৃষ্ণ, পৃ ২৮) তাছাড়া একই জেলা, একই সম্প্রদায, একই রক্তের লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে অনতিবিলম্বে সবাই আপন রক্তের ভাই-বোনের কাছাকাছি চলে যায়, যা সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে অমঙ্গলজনক। এটি চিকিৎসা বিজ্ঞান ও জেনেটিক্সের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এক্ষেত্রে অনাগত সন্তানের মধ্যে থ্যালাসেমিয়া, সিস্টিক ফাইব্রোসিস, জন্মগত হৃদরোগ, অন্ধত্ব বা স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রফির মতো জটিল রোগের ঝুঁকি থাকে। মৃত সন্তান প্রসব (stillbirth), গর্ভপাত, স্বল্পায়ু হওয়ার প্রবণতাও বেশি থাকে। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ জিনেটিক সমস্যায় যাতে না ভোগে এবং বৃহত্তর জাতিসত্তা গঠনের স্বার্থে অনতিবিলম্বে গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে যশোর, খুলনা ও বরিশাল প্রভৃতি জেলায় আন্তঃজেলা বাধা নিষেধ লোপ পায়। (বিশ্বাস, অনিলরঞ্জন, পৃ ৫৮)

ব্রাহ্ম ধর্ম ও মতুয়া ধর্ম: রাজা রামমোহন রায়কে বলা হয় ভারত পথিক, রেঁনেসার অগ্রদূত। ড. অজিত কুমার ঘোষ উল্লেখ করেছেন, তিনি ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হলেও সৃষ্টিকারী নিজে বেদান্তের বাইরে যেতে পারেননি, পৈতে ত্যাগ করতে পারেননি, এক টেবিলে সব জাতের মানুষকে নিয়ে খেতে বসতে পারেননি, ব্রাহ্মণের পক্ষে যেসব খাবার নিষিদ্ধ ছিলো, তার বাইরে গিয়েও কোনো খাবার খেতে পারেননি। আবার তিনি জাতপাতের বিরুদ্ধে লেখালেখি করেছেন, হিন্দু ধর্মীয় সতীদাহ প্রথা বিলোপের ক্ষেত্রে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তবে সতীদাহ সমস্যা ছিলো মুলতঃ উচ্চবর্ণীয় কতিপয় হিন্দুদের মধ্যে; সকলের নয়। তাছাড়া, ব্রাহ্ম ধর্মে মুচি, ডোম সকলের সাথে সকলের সমান ওঠাবসা ছিলো না। (ঠাকুর, কপিলকৃষ্ণ, পৃ ৩৬) ব্রাহ্ম ধর্মের শিবনাথ শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন, ব্রাহ্ম ধর্মের প্রভাব শুধুমাত্র সমাজের উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। ১৮৮৪ সালে কেশব

চন্দ্র সেনের দেহত্যাগ কালে ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য সংখ্যা যেখানে ছিলো ৬,৪০৯ জন, সেখানে মতুয়া ধর্মের সদস্য সংখ্যা ততোদিনে লাখ ছাড়িয়ে যায়। (ঠাকুর, কপিল কৃষ্ণ, পৃ ১৮)

জনস্বাস্থ্য ও মতুয়া ধর্ম: প্রচলিত প্রথায় পুরুষতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী সমাজপতিরা অন্ধকার জগতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তা হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুর বুঝেছিলেন। ব্রাহ্মণ পুরুষরা বহু পত্নী নিয়ে উশৃঙ্খল জীবনে মত্ত হয়ে উঠবে, মতুয়ারা তা মানতে চায়নি। এর নাম ব্যভিচার। এইসব ব্যভিচার বিদ্যাসাগরের মতো সমাজ সংস্কারকের সময়কালে অনেকটাই সামাজিক বৈধতা পায়। আর্য কৌলিন্য রক্ষার নামে সাত বছরের অনূঢ়া কন্যার বিবাহ সত্তর বছরের বৃদ্ধার সাথে হলে তা যে সুখের হয় না, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এটি ছিলো পরিবার পরিকল্পনাহীণ জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা। হরিচাঁদ ঠাকুর তাই ঠিক করে দিলেন 'এক নারী ব্রহ্মচারী' শ্লোগান। জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তখনো প্রান্তিক দরিদ্র, নিরক্ষর মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা আসেনি, তবে হরিচাঁদ ঠাকুর আত্মসংযমের পাঠ দিলেন,

"ঋতু রক্ষা করিবেক জীব হত্যা ভয়।
কেহ বা পূর্ণ সন্ন্যাসী নিষ্কাম আশ্রয়।।" (সরকার, তারকচন্দ্র, পৃ ৮)

গুরুচাঁদ ঠাকুরও জনস্বাস্থ্যের চেতনাকে আরো সম্প্রসারিত করেন- যত্রতত্র মলমূত্র পরিত্যাগের অভ্যাসকে তিনি সামাজিক গণ আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে যান। পাড়ায় পাড়ায় প্রতিটি বাড়িতে পায়খানা নির্মাণের কাজ শুরু করেন। রাস্তাঘাট, বাড়িঘর পরিচ্ছন্ন রাখার বিশেষ নজর দেন। অপরিচ্ছন্ন জামা কাপড় ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। স্বাধীনতা লাভের আট দশক পরে কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রী আজ যে 'স্বচ্ছ ভারত অভিযানে'র কথা বলেন, মতুয়া ধর্মে ভারত স্বাধীনতার বহু বছর আগেই তা কার্যকরী করে তোলেন। (বিশ্বাস, মনোহরমৌলি, পৃ ১২৩-১২৪)

জনসংস্কৃতি ও মতুয়া ধর্ম: ব্রাজিলের ফ্যাসিবাদী শাসন থেকে দরিদ্র ও কালো চামড়ার মানুষের উপর নির্মম অত্যাচার রক্ষা করতে নাট্য ব্যক্তিত্ব অগুস্ত বোআলের 'Dialogue' জন সংস্কৃতি গড়ে তোলেন সাধারণ মানুষের মননে ও মুখে। ঐ একই সময়ে, ভারতেও বর্ণ বিভাজিত ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মতুয়া ধর্মের জনসংস্কৃতি গড়ে ওঠে। অগুস্ত নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠ শোনাবেন বলে 'Centre for Theatre of the Oppressed' গড়ে তোলেন, আর বাংলার মাঠে ময়দানে সাধারণ মানুষের কথা তাঁদের দরবারে তুলে ধরার জন্য হরি-গুরুচাঁদের কর্মকাণ্ড নিয়ে মতুয়া ভক্ত, গোঁসাই, পাগলদের মাধ্যমে গড়ে ওঠে নাট্য আন্দোলন। সৃষ্টি হলো যাত্রাপালা, পালা কীর্তন, লীলাকীর্তন। ১৯১৬ সালে 'শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত' প্রকাশিত হওয়ার পর শুধু ১৯২০ সাল থেকে ১৯২৮ সালের মধ্যে তৈরী হলো সাত খানি যাত্রাপালা। পরবর্তী সময়ে হরি-গুরুচাঁদের প্রবল ভক্তদের কেন্দ্র করে মূদ্রণ জগতের আশির্বাদে আরো শতশত নাটক, যাত্রাপালা তৈরী হলো। অন্ত্যজ বাংলায় উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মতুয়া সমাজের নব জনসংস্কৃতির যে ইতিহাস, তাকে অবহেলা করা যায় না। (বিশ্বাস, মনোহরমৌলি, পৃ ১২৭-১৩১)

রাজনীতি ও মতুয়া ধর্ম: ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার শূদ্র, তপশিলি জাতির মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা, গণতান্ত্রিক বোধ ছিলো দূর্বল। চাষাবাদ থেকে সরকারি কাজে অংশগ্রহণের মাত্রা নেই বললেই চলে। এখানে শুধু বর্ণ বিভাজন আর জাতির মধ্যে উপজাতি। তাই নিজেদের মধ্যে থেকে জনপ্রতিনিধিত্ব না করতে পারলে তপশিলী জাতি তথা অবহেলিত সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হবে না, ধর্ম, শিক্ষা, চাকরি, মর্যাদা কোনো কিছুই হবে না, তা গুরুচাঁদ ঠাকুর বাস্তব উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

"তপশিলী জাতি, বলি যার পরিচয়।
মন্ত্রী-সংঘ মধ্যে তার প্রতিনিধি রয়।।

এই দলে অগ্রগামী নমঃশূদ্র জাতি।
তার মূলে গুরুচাঁদ অগতির গতি।।" (হালদার, মহানন্দ, পৃ ১৪৫)

বিশ্ব ইতিহাসে জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস (১৮১৮) সর্বহারা নিপীড়িত শ্রেণীর মুক্তির উপায় খুঁজতে গিয়ে বলেছেন, সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত তাদের মুক্তি নেই। ঐ একই সময়ে গুরুচাঁদ বলেছিলেন,

"জাতি, ধর্ম যাহা কিছু উঠাইতে চাও।
রাজশক্তি থাকে যদি যাহা চাও পাও।।" (হালদার, মহানন্দ, পৃ ৩৪৯)

পরবর্তী সময়ে ড. বি. আর. আম্বেদকর দলিতদের ললাট লিখন বদলাতে গিয়ে 'ক্ষমতার মন্দির' অর্থাৎ রাজনৈতিক অলিন্দে প্রবেশের উল্লেখ করেছেন।

রামকৃষ্ণ ও মতুয়া ধর্ম: শত-সহস্রাব্দ যাবৎকাল ভারতের মাটিতে যে ব্রাহ্মণ্যবাদী ধারা প্রবাহিত হয়, তা শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। আর তাঁর বিপরীত মেরুতে দেখা যায় শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরকে সমাজের আমূল বদলে দেওয়ার পক্ষে প্রতিবাদী রূপে। পূর্ব বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নমঃশূদ্র মানুষরা উচ্চবর্ণদের প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলবে, আর সেই কথা কাগজপত্রে ছাপা হবে, তা ছিলো কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতো। তাঁর মতো গুরুচাঁদ ঠাকুরের (১৮৪৬) কর্ম ভাবনা নিয়েও অবহেলা দেখা যায়। তবে কবি তারক চন্দ্র সরকার 'শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত', কবি মহানন্দ হালদার 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত', অস্ট্রেলিয় খ্রীষ্টান মিশনারী সি.এস. মীডের Guruchand Thakur and the Namahshudras of Bengal গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুর তথা মতুয়া ধর্মের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। অথচ হিন্দু ধর্মীয় রাম উপাসক ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬) কৈবর্ত ব্রাহ্মণ হওয়ার সুবাদে তাঁর পক্ষে প্রচারক, আর্থিক সহযোগিতা সবই সহায়ক হয়ে ওঠে। তাঁর পক্ষে বিদগ্ধ ব্যক্তি অধ্যাপক অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, কেশবচন্দ্র সেন, নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখের ছোঁয়া লেগে যায়। এছাড়াও বিদেশী পন্ডিত রমাঁ রোলাঁ (The Life of Ramakrishna), অধ্যাপক ম্যাক্স মুলার (Ramakrishna His Life and Saying) গ্রন্থের মধ্য দিয়ে সদর্থক হয়ে ওঠে। এতদসত্ত্বেও তিনি বিখ্যাত হয়েছেন বেদ ভিত্তিক হিন্দু ধর্মের নবায়ন রূপে, খ্রীষ্টান ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের ঈশ্বর ভাবনাকে আত্মোপলব্ধিতে আনার পরে এক নতুন পথ প্রদর্শক হিসাবে, বেদের নির্যাস বেদান্তকে সহজবোধ্য করে মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য। ধর্ম ব্যাখ্যা ও প্রচারে তিনি কিছু নতুনত্ব দেখালেও কোনো মতেই তাঁকে ধর্ম সংস্কারক বা সমাজ সংস্কারক বলা যায় না। তিনি স্রেফ প্রচলিত সামাজিক রীতি তথা ব্রাহ্মণ্যবাদের সফল অনুগামী, ধর্ম ব্যবস্থা তথা জাতপাত ও অস্পৃশ্যতা নিয়ে কখনো মাথা ঘামাননি। তাঁর ধর্ম ভাবনায় উচ্চ বর্ণের মানুষের কথা যতোটা ছিলো, সমাজের পতিত, দলিত মানুষের কথা ততোটা ছিলো না, আসলে তিনি প্রচলিত বর্ণাশ্রম প্রথার বিরোধী ছিলেন না। মানুষকে ঈশ্বর মুখী ও সংসার উদাসীন করে তোলাই ছিলো তাঁর মূল লক্ষ্য। দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ছোটো জাতের রানী রাসমণি। তাই সেখানকার মন্দিরের পূজারী বা উপাসক হতে রামকৃষ্ণ অস্বীকার করেন। এমনকি তিনি সেখানকার পুজোর প্রসাদ গ্রহণ করেননি যতোদিন না ঐ মন্দিরের সম্পত্তি রাসমণি ব্রহ্মোত্তর না করে দিয়েছিলেন। (বিশ্বাস, মনোহর মৌলি, পৃ ১১৮) তিনি বলেছেন, 'টাকা মাটি' এবং তাই টাকাকে গঙ্গায় ছুড়ে ফেলেছেন। অথচ মতুয়া আন্দোলনে মানুষের জাগতিক উন্নতি বিধানের কথা বলা হয়েছে, টাকাকে অনন্য উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করে। সেখানে পতিত, দলিত সকল মানুষের মুক্তির উপায় যেমন খোঁজার অন্বেষণ করা হয়েছে, তেমনি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। (ঠাকুর, কপিলকৃষ্ণ, পৃ ২০-২২, মতুয়া...)

বিবেকানন্দ ও মতুয়া ধর্ম: রামকৃষ্ণের মতো হিন্দু ধর্মের আরেক জগৎ বিখ্যাত প্রচারক ছিলেন এটর্নি বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩), যিনি রামকৃষ্ণের শিষ্য। তিনি বনেদি কায়স্থ পরিবারের শিক্ষিত মানুষ। সে সময় গুরুচাঁদ ঠাকুরের (১৮৪৬) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে আহামরি কিছু বলার মতো ছিলো না। তথাপিও তিনি স্বভাবে সমাজ দ্রষ্টা, পতিত, দলিত মানুষের জীবন সমস্যার এক মহান শরিক। তাঁর পতিত, দলিত সমাজের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, স্বাস্থ্য হীনতা নিয়ে তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা যে সামাজিক ঘৃণা ও শোষণের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করেন, তার থেকে তাঁদের মুক্তির উপায় দেখিয়েছেন। নিরক্ষরদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে তাঁর যে সীমাহীন অবদান, তা বিবেকানন্দ থেকে বহুগুণ অতিক্রম করে। আবার দারিদ্র্য মোচন ক'রে দলিত সমাজের মধ্যে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার যে প্রক্রিয়া এবং তার সমস্যা সমাধানের রূপকার হিসাবেও চিরন্তন মননে গুরুচাঁদ এক সুবৃহৎ স্থান দখল করে নিয়েছেন। ভারত আত্মার বিবেক বাণী হিন্দু ধর্ম নিয়ে সারা বিশ্বে স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন দেশে প্রচার করেছেন, বরানগরে 'শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ' প্রতিষ্ঠা করেছেন, চিকাগো শহরের 'Parliament of Religion' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন, বেদান্ত দর্শনের উপর হার্বার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য প্রথা উচ্ছেদের বদলে তিনি তাঁর প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, "... আমাদের কার্যের এই মূল কথাটা সর্বদা মনে রাখিবে, ধর্মে একবিন্দুও আঘাত না করিয়া জনসাধারণের উন্নতি বিধান।" তাঁর মতে, জাতি বিভাগ খুব ভালো। এটাকেই আমরা অনুসরণ করতে চাই। জাতি বিভাগ প্রণালীর উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে ব্রাহ্মণ করে তোলা এবং ব্রাহ্মণই হলো আমাদের আদর্শ মানুষ। তিনি আরো বলেছেন, আমাদের পূর্ব পুরুষগণ সমগ্র মানবজাতির জন্য যে সর্বাঙ্গসুন্দর প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্য নিখুঁত ভাবে কার্যে পরিণত কর। তোমাদের নিকট আমার ইহাই কেবল বক্তব্য যে, তোমরা সমগ্র মানবজাতির একত্ব ও মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্ব- এই বৈদান্তিক আদর্শ উত্তরোত্তর অধিকতর উপলব্ধি করিতে থাক। তাঁর মতে, জাগতিক উন্নতি বিধান ধর্মের কাজ নয়। যদি তাই হয়, তাহলে তিনি কেনো সরব হয়েছিলেন যখন চন্ডাল, মুচি, মেথররা ধর্মান্তরিত হতে থাকে? তবে তিনি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে নীচু জাতির শিক্ষা প্রসারের কথা উল্লেখ করেছেন। আধুনিক মনন জানতে চায়, সব যদি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে জ্ঞান, বুদ্ধি ও মানবিক মর্যাদার চেতনা দীর্ঘ মেয়াদী হয়ে যায় না? আসলে ব্রাহ্মণ্যবাদীর গলদ স্বামীজী উপলব্ধি করতে পারলেও তিনি তার বিরুদ্ধে যেতে পারেননি। তিনি শূদ্রদের দুঃখ নিয়ে বক্তৃতা করেছেন, কিন্তু যে সকল ধর্ম গ্রন্থ গুলি শূদ্রদের অমর্যাদা করেছে, তার বিরুদ্ধে একটা নিন্দাসূচক শব্দ ব্যবহার করেননি, বরং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মনুসংহিতা'র নিন্দা করেছেন, অমানবিক নিয়ম ভেঙে নতুন নিয়ম গড়ার কথা বলেছেন, ধর্মকে কারাগারের সাথে তুলনা করেছেন। কিন্তু বিবেকানন্দদের মতো হিন্দু ধর্মীয় সাধক ও প্রচারকরা তার বিন্দুমাত্র আঙ্গুল তুলতে পারেননি (বিশ্বাস, মনোহরমৌলী, পৃ ১০১-১০৬)

তবে, চারিত্রিক গুণে হরিচাঁদ ঠাকুর সেকালের উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু বাঙালী মনিষীদের তুলনায় অনেক বেশী নির্ভীক ও দৃঢ়চেতা ছিলেন। হরিচাঁদ ঠাকুর শুধু ধর্ম সংস্কার করেই ক্ষান্ত থাকেননি, সমাজে শিক্ষার প্রসার, প্রচলিত প্রথা ভেঙে নিম্নবর্ণের মানুষকে ব্যবসা করতে উৎসাহিত করা, পতিত জমি আবাদীকরণের মাধ্যমে কৃষকদের উন্নতি সাধনে উদ্যোগী হওয়া, মানুষের সেবা দেওয়া, রক্ষিতা প্রথা উচ্ছেদ ও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে ওঠেন। ধর্মসংস্কারের মাধ্যমে হীনমন্যতা ও বৈষম্য বোধের অবসান কাটিয়ে কর্মকে প্রাধান্য দিয়ে সমাজে যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন, তা মতুয়া ধর্মের অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে পতিত জাতির উন্নয়নে সহজসাধ্য হয়ে যায়। (ঠাকুর, কপিল কৃষ্ণ, পৃ ২০-২২)

গুরুবাদ ও মতুয়া ধর্ম: প্রচলিত ধর্ম মতে, ভক্তের কানে আরাধ্য দেবতাকে শয়নে স্বপনে পাওয়ার জন্য গুরুর নেতৃত্বে যে মন্ত্র কানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তাকে বলা হয় বীজমন্ত্র বা মন্ত্র দীক্ষা। এর মধ্য দিয়ে দেহ শুদ্ধিকরণ বা পুনর্জন্ম লাভ করার কথা বলা হয়। বৈদিক মতে, ব্রাহ্মণ হচ্ছে কুলগুরু, তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়া বাঞ্ছনীয়, আর শিক্ষা নিতে হয় বৈষ্ণবের কাছ থেকে। ভক্তকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য এইভাবে গড়ে ওঠে গুরুকরণ বা গুরুবাদ। হিন্দু ধর্মে বহু ঈশ্বরের আরাধনা করা হয়; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, রাম, কৃষ্ণ, নারায়ণ প্রমুখ এবং সকলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গুরু বর্তমান থাকে। তাঁদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি যে এক, গুরু হওয়ার মানসিকতাও এক, তা নয়। ফলে মিস গাইড হওয়া ও শোষণ, বঞ্চনা এবং নিপীড়নের সম্ভাবনা থাকে। তাই শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত গ্রন্থে বলা হয়েছে,

"মতুয়ার এক গুরু ভিন্ন গুরু নাই।
ওড়াকান্দী প্রভু যিনি ক্ষীরোদের সাঁই।।" (হালদার, মহানন্দ, পৃ ৫৭৩)

গুরুচাঁদ ঠাকুর খুলনার লক্ষ্মীখালি জাগরণী সভায় বলেন, মতুয়ারা সব শান্তবী ভাবের দীক্ষায় (সরাসরি সংযোগ ক্রিয়া) দীক্ষিত। শ্রীহরিচাঁদের আলো যার গায়ে লাগে, তার আর কোনো জোনাকীর আলো প্রয়োজন হয়না। 'হরিনাম'ই হলো মতুয়াদের আসল মন্ত্র; বীজমন্ত্র, সেখানে সত্য কথা বলা ও পবিত্র চরিত্র গঠনের হিসাব রয়েছে। এরপরে শিক্ষা ও ধন প্রাপ্তি ঠিকঠাক হলেই পতিতের মুক্তি সম্ভব। (ঠাকুর, কপিল কৃষ্ণ, পৃ ১২-১৪)

সর্বজনগ্রাহ্য ও মতুয়া ধর্ম: ভারতবর্ষে ধর্মের ইতিহাসে হিন্দু ধর্ম সব থেকে প্রাচীন। তার প্রতিষ্ঠাতা কে, তার নাম জানা যায় না। অথচ তার আচার বিচার জটিল এবং ব্যায়বহুল। এখানে পুরোহিততন্ত্রের যাগযজ্ঞের যাতাকলে পড়ে সাধারণ দরিদ্র, অশিক্ষিত মানুষ সর্বশান্ত হয়ে যায়। যে ধর্ম বর্ণগত উঁচু-নীচু ভুলে সকলকে সমান চোখে দেখে না, ঘৃণা করে, সেটা ধর্ম হতে পারে না। যেখানে সত্য নেই, সেটা ধর্ম হতে পারে না। মতুয়ারা সত্যের পূজারী। তাই নির্দিধায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তেলি, মালি ভিড়ে যায়। তাই ফরিদপুর জেলার দিঘলিয়া গ্রামের মধুসূদন চক্রবর্তীর একমাত্র পুত্র অক্ষয় চক্রবর্তী উপবীত একটানে ছিড়ে দেয়, রাধা চক্রবর্তী (রাধা পাগল), গোলক গোস্বামী, রামভরত মিশ্র, জগদীশ চক্রবর্তী, ধীরেন ব্যানার্জী, কালীয়ার পঞ্চানন চক্রবর্তী, অমৃতলাল মুখার্জী মতুয়া হয়ে যান। খাসীয়ালী গ্রামের কুলীন কায়স্থ পিরিতিরাম বসুর পুত্র নবীন চন্দ্র বসু, ধনপতি পরিবারের চন্দ্রনাথ মল্লিকের পুত্র রাধানাথ মল্লিক, জয়পুর গ্রামের প্রহ্লাদ পাটনী, মুন্সেফ রসিক সরকার, কালীয়া গ্রামের পঞ্চানন ঠাকুর, মুসলমান পরিবার থেকে খুলনা তেরখাদার পাঁচকড়ি মিঞা, তাঁর নাতি জলিলুদ্দিন মিঞা, তিনকড়ি মিঞা, চাঁদকাজী, দিলওয়ার হোসেন মতুয়া হয়ে যান। তেরখাদার রাজবংশীরা, দক্ষিণ বাংলার মাহিষ্য, কাপালীরা মতুয়া হয়েছেন। ছত্রিশ বর্ণের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। ১৯১৩ সালে তারক চন্দ্র সরকার উল্লেখ করেছেন,

"ব্রাহ্মণ কায়স্থ কুন্ডু পাল ঝালো মালো।
নমঃশূদ্র সাহা সাধু একত্র হইল।।" (সরকার, তারক চন্দ্র, পৃ ২৩৫)

আবার মহানন্দ হালদার উল্লেখ করেছেন,

"আমার পিতার ভক্ত আছে যতজন।
এক জাতি বলে তারা হয়েছে গণ।।
লোকাচারে তারা কেহ কায়স্থ ব্রাহ্মণ।
'মতুয়া'র মধ্যে তাহা নাহি নিরূপণ।।" (হালদার, মহানন্দ, পৃ ২০১)

অস্ট্রেলিয়া থেকে আসা খ্রীষ্টান মিশনারি ডাঃ সি এস মীড সাহেব তিনিও মতুয়া অনুরাগী হয়ে ওঠেন এবং তাঁর সহধর্মিনী মিচটাক গুরুচাঁদ ঠাকুরকে 'ধর্মপিতা' উল্লেখ করেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু গুরুচাঁদ ঠাকুরকে

'মহাপুরুষ' এবং গান্ধীজি 'মহান গুরুচাঁদ' উল্লেখ করেন। বাংলার তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মতুয়া ধর্মে গ্রহণের আগ্রহ দেখান, যদিও উচ্চবর্ণরা তাতে জল ঢালার অনেক কায়দা করেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনন্দ বাজার পত্রিকায় ১৮/১০/২০০৯ তারিখে প্রথম পাতায় বলা হয় মতুয়া ধর্ম নাকি শুধু 'নমঃশূদ্র'দের ধর্ম; মমতা ব্যানার্জীর মতো ব্রাহ্মণ কন্যাদের জন্য নয়! (বিশ্বাস, মনোহরমৌলি, পৃ ১৩১-১৩৬) তবে লক্ষনীয় বিষয় হলো, মতুয়া ধর্ম নমঃশূদ্রদের ঘরে সৃষ্টি হয়েছে মানে তা খারাপ, আধুনিক মনন এই যুক্তি মানতে পারে না। আর এইখানে উচ্চবর্ণদের সংকীর্ণতা। গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেছেন, আমার নমঃশূদ্র বংশে জন্ম হলেও আমি শুধু তাঁদের একার নই; অস্পৃশ্য, দরিদ্র, পীড়িত সমস্ত মানুষের দুঃখ নিবারণের সাথী। (হালদার, মহানন্দ, পৃ ১৪৪)

উপসংহার: হরিচাঁদের আগে হিন্দু ধর্মের কোনো গ্রন্থ বা সমাজ সংস্কারক বলেননি যারা হিন্দু ধর্মের চতুর্বর্ণকে ভেঙ্গে ফেলতে চায়। চতুর্বর্ণকে সামনে রেখেই হিন্দু ধর্মকে সব কালে চিরায়ত করে তোলা হয়েছে, যাকে বলা হয় Intellectual Fascism. (বিশ্বাস, মনোহরমৌলী, পৃ ১৩৯) আর তা ভাঙ্গার কারিগর হলো আত্মনির্ভরশীল গড়ে তোলা শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের মতুয়া ধর্ম দর্শন। এরমধ্যেই ভারতীয় জনগণ সাম্য ও মানবিক মূল্যবোধের সদর দরজা খুঁজে পায়। আর এসবের বিঘ্নকারী হলো বেদ। সে বিষয়ে হরিচাঁদ ঠাকুর বলেছেন,

"কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পেলে খাই।
বেদ বিধি শৌচাচার নাহি মানি তাই।।" (সরকার, তারকচন্দ্র, পৃ ১০৪)

তেমনি হিন্দু ধর্ম গ্রন্থাবলী নিয়েও গুরুচাঁদ ঠাকুরের বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন,

"ব্রাহ্মণ রচিত যত অভিনব গ্রন্থ।
'ব্রাহ্মণ প্রধান' মার্কা বিজ্ঞাপন যন্ত্র।।
তন্ত্র মন্ত্র ভেল্কী ভোজ রচি দিনে দিনে।
গূঢ়ার্থ বাহির করে স্বার্থের সন্ধানে।।" (হালদার, মহানন্দ, পৃ ২৩)

সমাজের চতুর্দিকে যেসব ব্রাহ্মণ পরিলক্ষিত হয়, তারা সব ফেক। (হালদার, মহানন্দ, পৃ ১০) মতুয়ারা প্রচলিত ব্রাহ্মণ কেন্দ্রিক ধর্মাচারে কোনোকালে বিশ্বাসী নয় এবং তাঁরা প্রতিবাদী, সর্বাধুনিক ও স্বতন্ত্র সত্ত্বায় গড়ে উঠেছে। সঙ্গত কারণেই অন্ধ্রপ্রদেশের কুরুমা মেষপালক দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষ ইলাইয়া ইসলামিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক কাঞ্জা ইলাইয়া Post-Hindu-India গ্রন্থে (২০০৯) স্পর্ধা দেখিয়ে বলতে পেরেছেন, ভারতবর্ষে দলিত বহুজন নামে যারা পরিচিত আছে, তারাই আসলে সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ঘটিয়েছেন আর কেউ নয়। (বিশ্বাস, মনোহরমৌলী, পৃ ১৩৭)

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, কপিলকৃষ্ণ। মতুয়া আন্দোলন ও বাংলার অনুন্নত সমাজ। হরিচাঁদ মিশন, বামনগাছি, ১৯৯৪।
২. ঠাকুর, কপিলকৃষ্ণ। সম্পাদিত গ্রন্থ-গুরুচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া আন্দোলন। নিখিল ভারত প্রকাশনী, কলকাতা-১২৭, ২০১৬।
৩. বৈরাগ্য, পুষ্প। মতুয়া ধর্মে নারী। সম্পাদিত গ্রন্থ- শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর স্বর্ণ সংকলন, ঐকতান, কলকাতা, ২০১৫।
৪. বিশ্বাস, অনিলরঞ্জন। অন্ত্যজ বাংলার নবজাগরণে গুরুচাঁদের ভূমিকা। সম্পাদিত গ্রন্থ- গুরুচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া আন্দোলন, নিখিল ভারত প্রকাশনী, কলকাতা-১২৭, ২০১৬।

৫. বিশ্বাস, মনোশান্ত। বাংলার মতুয়া আন্দোলন- সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি। সেতু প্রকাশনী, কলকাতা-৬, ২০১৬।
৬. বিশ্বাস, মনোহরমৌলী। প্রবন্ধে প্রান্তজনঃ অথবা অস্পৃশ্যের ডাইরি। চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা-৭৩, ২০১০।
৭. বিশ্বাস, মনোহরমৌলী। মতুয়া ধর্ম ও সম্প্রদায়। চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা-৭৩, ২০১৯।
৮. মুখোপাধ্যায়, প্রলয়দেব। রাষ্ট্র ও রাজনীতি- তত্ত্ব ও মতবাদিক বিতর্ক। ভি পি এইচ সাবস্ক্রিপশন সার্ভিসেস, কোলকাতা, ২০০৯।
৯. সরকার, তারকচন্দ্র। শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত। মতুয়া সাহিত্য মন্দির, ওড়াকান্দী, ২০১০।
১০. সরকার, জীবন কুমার। মতুয়া ধর্ম আন্দোলনে শিক্ষা ভাবনা। সম্পাদিত গ্রন্থ- শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর স্বর্ণ সংকলন, ঐকতান, কলকাতা-৯১, ২০১৫।
১১. হালদার, মহানন্দ। শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত। মতুয়া মহাসংঘ, ঠাকুরনগর, ২০০৯।